বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত।

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?"

নিধিরাম গুপ্ত।

বঙ্গ-ভাষা সমালোচনী সভা কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক
কলিকাতা,—শোভাবাজার,—গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং ভবনস্থ
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে
মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৩৫।

বিজ্ঞাপন।

কয়েক বৎসর হইল আমি জাতীয় সভায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে উপস্থিত মতে বক্তৃতা করি; সে বক্তৃতা করিবার সময় তাহা কাহারও দ্বারা আনুপূর্ব্বিক লিখিত না হওয়াতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কেবল তাহার সার মর্ম্ম "ন্যাশন্যাল পেপর" ও "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৯৮ শকের ১৯ এ বৈশাখ দিবসে মেদিনীপুরে ঐ বিষয়ে উপস্থিত মতে এক বক্তৃতা করি, তাহা লিখিত হইয়া ঐ বৎসরের ৪ ঠা অগ্রহায়ণ দিবসে কলিকাতার বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। সে অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। "ভারত সংস্কারক" সম্বাদ পত্রে এই বক্তৃতার যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সংশোধনকালে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমি কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে, এই বক্তৃতা প্রণয়নে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" ও লং সাহেবের সঙ্কলিত "Descriptive Catalogue of Bengalee Books" নামক পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থে ভূয়সী দোষ-গুণ-

বিচার-ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমপরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যদি বড় বড় গ্রন্থকর্ত্তার সামান্য ব্যাকরণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ লইয়া তুল-কালাম্ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ আরো প্রশংসনীয় হইত। অবশেষে বক্তব্য এই যে, এই বক্তৃতায় যাহা আছে, তাহা কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিবৃত্তিক বিবরণ বিষয়ক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এমত নহে; আমার নিজের জীবনের দর্শনও অনেক সহকারিতা করিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। তথাপি আশঙ্কা হইতেছে, এই বক্তৃতায় অনেক উপযুক্ত গ্রন্থকারের নাম অথবা তৎপ্রণীত কোন কোন গ্রন্থের উল্লেখ করি নাই; যদি মানবীয় অপূর্ণতা হেতু এই ও অন্যান্য প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে, তবে ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ও উল্লিখিত গ্রন্থকারেরা স্বীয় স্বীয় ঔদার্য্যগুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা এই পুস্তিকা প্রকাশ করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি সভার সাহায্য জন্য তাহার প্রথম মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত আয় সভাকে অর্পণ করিয়াছি। সভার অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে শোভাবাজার-নিবাসী সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর উক্ত ভার সম্পাদনে সভাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ইতি।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

কলিকাতা।

১৩ই বৈশাখ,—১৮০০ শক।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।

আমি অদ্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ে কিছু বলিবার মানস করি। এই বক্তৃতা করিবার সময় কোন কোন কবির গুণপরিচায়ক দুই একটি কবিতা পাঠ করিয়া আপনাদিগকে শুনাইবার ইচ্ছা আছে; কিন্তু এমন সকল কবির গ্রন্থ হইতে আমি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিব যে, যাঁহারা উৎকৃষ্ট কবি, কিন্তু যাঁহাদিগের গ্রন্থ অত্যন্ত প্রচলিত নহে।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ে বলিতে গেলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? হাউএনথ্‌স্যাঙ্‌ নামক একজন চীনদেশীয় পর্য্যটক খ্রীষ্টীয় শকের সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান বঙ্গ, বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কিয়দংশের ভাষা এক ছিল, কেবল আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষা একটু পৃথক্‌ ছিল। এই ভাষা বোধ হয়, মাগধী-প্রাকৃত-ভাষোৎপন্ন একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী ছিল। চাঁদকবির কবিতার ভাষা যেমন শৌরসেনী-প্রাকৃত-সমুদ্ভূত একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী, উল্লিখিত

হিন্দীভাষা সেইরূপ মাগধী-প্রাকৃত-সমুদ্ভূত অন্য প্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী। এ ভাষা হইতে বেহার অঞ্চলের হিন্দী ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য বাঙ্গালা ভাষার অত্যন্ত প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থের ভাষা কতকটা হিন্দীর ন্যায়। ভাষার কুলজী ধরিয়া গেলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষা একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী হইতে, সেই প্রাচীন হিন্দী মাগধী-প্রাকৃত হইতে, মাগধী পালী হইতে, পালী গাথা হইতে এবং গাথা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি বঙ্গভাষার আদি কবি। যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থে এই রূপ লিখিত আছে যে, বিদ্যাপতি শিবসিংহনামক এক রাজার সভাসদ্ ছিলেন। কিন্তু, ঐ প্রস্তাবলেখকেরা অনুমান করেন যে, শিবসিংহ বাঁকুড়া অথবা বীরভূম প্রদেশের একজন জমীদার ছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সদ্বিদ্বান্ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদর্শনে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শিবসিংহ মিথিলাপ্রদেশের রাজা ছিলেন। মিথিলাতে পঞ্জীনামে এক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ঐ গ্রন্থে মিথিলার রাজা ও শ্রেষ্ঠ লোকদিগের বংশাবলী এবং জন্ম ও মৃত্যুর শক লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শিবসিংহ মিথিলার রাজা ও বিদ্যাপতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। শিবসিংহ ১৩৬৯ শক হইতে সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, সে প্রবাদ এই যে, "রাজা শিবসিংহের মহিষী

লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রসক্তি ছিল এবং লছিমাকে না দেখিলে তাঁহার কবিতা নিঃসৃত হইত না। রাজা এই বিষয় অবগত হইয়া সন্দেহভঞ্জনার্থ মধ্যে মধ্যে বিদ্যাপতিকে গৃহবদ্ধ করিয়া কবিতা রচিতে বলিতেন, বিদ্যাপতি তাহাতে অসমর্থ হইলে লছিমা কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে ঐ গৃহের গবাক্ষপথে উপস্থিত হইয়া দেখা দিতেন এবং অমনি বিদ্যাপতির মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইত। এইরূপে যে সকল কবিতা রচিত হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক, রাজা ইহাতে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাপতিকে শূলে দেন। বিদ্যাপতি শূল-বিদ্ধ হইয়াও অকস্মাৎ লছিমাকে তথায় দর্শন ও গীতার্দ্ধ রচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।”* এই আখ্যান অবিশুদ্ধরূপে ইতালী দেশীয় মহাকবি দরিদ্র ট্যাসো এবং তাঁহার প্রিয়তমা অতুল ধনশালী সুমহৎ এষ্টে বংশীয় রাজকুমারী লিয়োনারার গল্প স্মরণ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই প্রবাদ অত্যন্ত প্রচলিত আছে যে, কবি বিদ্যাপতি একজন পরম সাধক ছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, তিনি তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া ভাগীরথীনীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে তাহার তীরে গমন করিতেছিলেন। বাঢ় নামক স্থানে চলৎ-শক্তিরহিত হইয়া পড়াতে গঙ্গাকে তথায় আগমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গঙ্গা তথায় আগমন করিয়া তাঁহার

---

* রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। —(দ্বিতীয়ভাগের ভূমিকা।)

মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই জন্য উক্ত স্থানে গঙ্গাকে এক্ষণে ত্রিধারা হইতে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতি যেরূপ সাধক ছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত গর্হিত প্রণয়ের গল্প তাঁহার জীবনের সহিত সঙ্গত হয় না।

বিদ্যাপতির অধিকাংশ কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচিত। অল্পসংখ্যক কবিতা বাঙ্গালাভাষায় রচিত দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করেন যে, তিনি তাঁহার সকল কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা তাহা সর্ব্বদা গীত ও তাহাদিগের দ্বারা তাহা পুনঃপুনঃ প্রতিলিপিকৃত হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন কবিতা অনেকটা বাঙ্গালা রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার সকল কবিতা সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিত। কেন না মৈথিলী হিন্দীতে রচিত কি বাঙ্গালায় রচিত তাঁহার সকল পদাবলীই বৈষ্ণবদিগের দ্বারা অত্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে যে, যেমন স্কট্‌লণ্ডের বর্‌ন্স কবি তাঁহার কতকগুলি কবিতা ইংরাজীতে ও কতকগুলি কবিতা স্কচ্ ভাষাতে রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে ও কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মিথিলাপ্রদেশের লোকেরা ও বঙ্গদেশের লোকেরা আপনাদিগকে প্রায় একদেশের লোক মনে করিত। মিথিলা পঞ্চগৌড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেক দিন অবধি সেনবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তথায় বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের অব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এই

সকল কারণবশতঃ মিথিলাপ্রদেশের লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের লোকদিগের বিলক্ষণ সখ্যভাব ছিল ও এই সখ্যভাব নিবন্ধন বঙ্গদেশের লোকেরা মিথিলার লোকদিগের নিকট হইতে অনেক মানসিক উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রথমে মিথিলা প্রদেশে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে তাহা প্রচার করেন। আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিহুতী ছাঁদের অক্ষর। মিথিলার সঙ্গে যখন বঙ্গদেশের এতদ্রূপ নিকট সম্বন্ধ ছিল, তখন ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে এবং কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির দুই একটি কবিতা যাহা কেহ কখন উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি :—

১

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু
দয়া করি না ছাড়বি মোয়।

গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥

কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

২

তাতল সৈকত, বারিবিন্দুসম
সুতমিত রমণীসমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে॥

মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥

আধ জনম হাম, নিঁদে গোঙাইনু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা॥

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর লহরী সমানা॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমনভয়ে
তুয়া বিনা গতি নাহি আর।
আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি,
ভবতারণ ভার তোহার॥"

বিদ্যাপতির এই দুইটি কবিতা তখনকার বাঙ্গালা ভাষায় রচিত; পূর্ব্বে এক স্থানে উল্লিখিত কারণবশতঃ হিন্দীর সহিত ঐ ভাষার কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু যাহা হউক, উহা বাঙ্গালা, এইজন্য অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝা যায়; কিন্তু তাঁহার এমন সকল কবিতা আছে, যাহা ঐরূপ সহজে বুঝা যায় না। তাহা মৈথিলী হিন্দীতে বিরচিত।

বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী এক কবি ছিলেন, তাঁহার নাম চণ্ডিদাস। তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন না, তিনি বঙ্গবাসী ছিলেন। তিনি বীরভূম প্রদেশের নান্নুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার অত্যন্ত সখ্যভাব ছিল। তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিদ্যাপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এবং বিদ্যাপতির অজ্ঞাতসারে তিনিও বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে দুইজনের সাক্ষাৎ হইল, এই বিষয়ে চণ্ডিদাসের বন্ধু রূপনারায়ণ একটি মনোহর কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি :—

"চণ্ডিদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডিদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল। সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডিদাস তব্ রহই না পারহি চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুঁহুজন দুঁহু গুণ গাওত দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জাগি॥

দৈবহি দুঁহু দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুঁহু দোঁহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই॥
তথা ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস তথি রূপনারায়ণসঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥"

উক্ত কবিতাতে "রূপনারায়ণ গোই" এই বাক্য থাকাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, রূপনারায়ণ উহার রচয়িতা ছিলেন। "গোই" পারসী শব্দ, উহার অর্থ—"বলে"।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের অব্যবহিত পরেই চৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যেরা বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। চৈতন্য ১৪০৭ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৫৫ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতন্য যে সময়ে বঙ্গদেশে ধর্ম্মসংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পঞ্জাবে নানক ও ইউরোপে লুথার ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই সময়ে পৃথিবীতে কেমন একটি ধর্ম্মসংস্কারের হাওয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মোৎসাহ সাংক্রামিক। চৈতন্য নিজে ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য অন্যকে মাতাইতে সক্ষম হইতেন। তিনি যখন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে হরিনাম ব্যতীত অন্য শব্দ বিনির্গত হইত না। তিনি অসামান্য রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির প্রতি সহকারিতা করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষে সুগম রাজমার্গ অথবা লৌহবর্ত্ম ছিল না, তথাপি চৈতন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত

উৎসাহ সহকারে স্বকীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। আমি কাণপুরপ্রভৃতি দেশে চৈতন্যমতাবলম্বী হিন্দুস্থানী দেখিয়াছি। ধর্ম্মসংস্কারসম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সম্পাদন করিতে ভীত হয়েন, চৈতন্য ধর্ম্মোন্মত্ততার সাংক্রামিক গুণপ্রভাবে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেন, অসবর্ণ-বিবাহ দিয়াছিলেন এবং দুই তিনটি মুসলমানকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্কার বিধেয় কি না ও কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায় নহে, সাধারণ হিন্দুসমাজমধ্যে তাহা প্রচলিত হইতে পারে কি না এই বিষয় বিচার জন্য বর্ত্তমান স্থান ও উপলক্ষ উপযুক্ত নহে।

চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার এই সময়ে বাঙ্গালীর মনকে নূতন জীবন প্রদান করিয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষা নূতন উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্মবিষয়ে অনেক নূতন গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে রূপ গোস্বামী রিপু-দমন-বিষয়ে রাগময় কোণ, সনাতন গোস্বামী রসময় কলিকা, জীব গোস্বামী করচাই, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত, লোচন চৈতন্যমঙ্গল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে রায়শেখর, বাসু ঘোষ, নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস, যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ে নানাপ্রকার পদাবলি সকল রচনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ের বাঙ্গালাভাষার অবস্থার নিদর্শনস্বরূপ গোবিন্দদাসের একটি পদ আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি:—

"ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দু।
দুর্ল্লভ মানুষ জনমে সতসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু॥
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী জাগি।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলাভ লাগি॥
এরূপ যৌবন ভবন ধনজন কি আছে ইথে পরতীত।
কমলদল জল জীবন টলমল সেবহ হরিপদ নিত॥"

এক্ষণে আমরা কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ও কাশীদাসের কালে আগমন করিতেছি। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সুবিধার জন্য কবিকঙ্কণের কথা অগ্রে বলিব; পরে কৃত্তিবাস ও কাশীরামকে একটি যুগল-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের বিষয় এককালে বলিব। কিন্তু ইঁহাদিগের কথা বলিবার অগ্রে আর একটি কবির কথা সারিয়া রাখিতে চাহি। সেই কবির নাম ক্ষেমানন্দ। ইনি কবিকঙ্কণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষেমানন্দ প্রকৃতির অকপট পুত্রকন্যা স্ত্রীলোক ও ইতর লোকদিগের মনোমোহনকারী প্রসিদ্ধ মনসার ভাসান রচনা করেন। শুনিতে পাই যে, নারায়ণদেব ও দ্বিজবংশী নামক মনসার ভাসান পূর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা আমি কখন শ্রবণ অথবা পাঠ করি নাই। অতএব তাহা কিরূপ, তাহা বলিতে পারি না।

কবিকঙ্কণের প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। তিনি জেলা বর্দ্ধমানের সেলিমাবাদ পরগণার দামুন্যা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৪৯৫ শকে চণ্ডীকাব্য রচনা আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শকে তাহা শেষ করেন। তিনি কোন মুসলমান জমীদারের অত্যাচারবশতঃ স্বগ্রাম পরিত্যাগ

করতঃ মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূম পরগণার আঁড়রা গ্রামের জমীদার বাঁকুড়া রায়ের নিকট আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি পথিমধ্যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন চণ্ডী আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিষয়ে একখানি কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন। চণ্ডীকাব্যে যেখানে এই ঘটনা বর্ণিত আছে, সেই অংশটুকু আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি :——

"বাহিল গোড়াইনদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি,
তেউটায় হইনু উপনীত।
দ্বারকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুলপুরী,
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর,
উপনীত গোথড়ানগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান,
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥"

হায়! হায়! কবি কি দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন!

"আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া,
পূজা কৈনু কুমুদপ্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া,
আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত।
গোথড়া ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই,
আঁড়রায় গিয়া উপনীত॥

আঁড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিমু নৃপমণি,
রাজা দিল দশ আড়া ধান॥"

কি সন্তোষচিত্ত! দশ আড়া ধানে এত সন্তুষ্ট!

"বীর মাধবের সুত, বাঁকুড়াদেব গুণযুত,
শিশু পাঠে কৈল নিযোজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপ গুণে অবদাত,
গুরু করি করিল পূজিত॥
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য।
হাতে করি পত্র মসী, আপনি কলমে বসি,
নানা ছাঁদে লেখান কবিত্ব॥
সঙ্গে ভাই রামানন্দি, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
মম ভাষা করিও কুশল॥"

ভ্রাতৃস্নেহের পুরাবৃত্তে রামানন্দের দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হইতে পারে।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, "উপরি লিখিত সন্দর্ভটি মুদ্রিত কবিকঙ্কণচণ্ডী হইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে। কবিকঙ্কণ আঁড়রা গ্রামের যে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের

বংশীয়েরা উক্ত আঁড়রা গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী 'সেনাপতে' নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্ত্তমান আছে, তাহা কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্য কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের আত্মীয় মেদিনীপুর জেলার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই পুস্তক হইতে উপরি উক্ত সন্দর্ভটি সমুদায় লেখাইয়া আনিয়া দিয়াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত সেনাপতে গ্রামের দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের পাঠানুসারে বহুল অংশে বিশোধিত হইয়াছে।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন সেনাপতে গ্রামের রাজবংশ দ্বারা রক্ষিত যে চণ্ডীগ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি যে, উক্ত পুস্তক সেই বংশের লোক দ্বারা প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকে এবং পূজার সময় প্রতিদিন চন্দনচর্চ্চিত হওয়াতে কোন কোন স্থানে তাহার অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। কি মানবস্বভাব-পরিজ্ঞান, কি বাহ্য-জগদ্বর্ণনা-নৈপুণ্য, কি করুণারসের উদ্দীপনাশক্তি, কি সুকল্পনা, সকল বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয়। যদি তাঁহার মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে যে স্থলে অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাই-বার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। যদি তাঁহার বাহ্য-জগদ্বর্ণনা-নৈপুণ্য বিশেষরূপে দেখিতে চাও, তবে তাঁহার বর্ণিত কলিঙ্গায় ঝড়-

বৃষ্টির বর্ণন ও মগরায়ও ঐ ঘটনার বর্ণন পাঠ কর। যদি তাঁহার করুণারস উদ্দীপন-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাইতে চাও, তবে ধনপতির কারামোচনকালে আক্ষেপ-উক্তি পাঠ কর। যদি এই তিন গুণের একত্র মিশ্রণ দেখিতে চাও, তবে ফুল্লরার বারমাস্যা পাঠ কর। যদি তাঁহার সুকল্পনাশক্তির বিশেষ নিদর্শন দেখিতে চাও, তবে কালীদহের কমলকামিনী-কর্ত্তৃক করিগ্রাস ও উদ্গীরণব্যাপার বর্ণন এবং যে স্থানে পাত্রমিত্র সভাসদ্ লইয়া পশুরাজ সিংহের বার দিয়া বসা বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। এই দুই স্থলে মুকুন্দরাম সুকল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। ভারত-চন্দ্র তাঁহাকে অনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেন। ভারত-চন্দ্রের অনেক স্থানের ভাব পার্সি ও সংস্কৃত হইতে নীত। এসিয়া কিম্বা ইউরোপখণ্ডের এমন কোন কবি নাই, যাঁহাকে মাইকেল মধুসূদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল-রচনা-শক্তি বিষয়ে মোটাধুতি ও দোজা পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ শোভন ধুতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোট পেণ্টু-লন পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের দুইটি মনোহর লক্ষণ আছে। সে দুইটি মনোহর লক্ষণ এই যে, তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্রজীবন যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন কবি সেরূপ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার আদিরস বর্ণনাতে কিছুমাত্র অশ্লীলতা নাই। "দরিদ্রের কবি"

এই গৌরবাস্পদ উপাধি যেমন তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তেমন অন্য কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

কৃত্তিবাস ফুলেগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৪৬০ শকে রামায়ণ রচনা করেন। কাশীরাম দাস জেলা বর্দ্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত রচনা করেন। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের মুদি বকালি পর্য্যন্ত সকলে উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। ইহা বিবেচনা করিলে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে অল্প সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। কবিদিগের সৌভাগ্য প্রধান প্রধান সেনাপতি ও রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত কামনা করিয়া থাকেন। কুইবেকের যুদ্ধের পূর্ব্বদিন জেনারল উল্‌ফ ইংরাজী কবি গ্রে-প্রণীত "Elegy written in a country-churchyard." নামক কবিতা পাঠ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কল্য ফরাসিস্‌দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করা অপেক্ষা এই কবিতার রচয়িতা হইতে বাসনা হয়। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে। আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা জাহাজি গোরার ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া আইসে। কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদ-পত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।

কাশীরাম দাসের পর রামেশ্বর প্রাদুর্ভূত হন। তিনি হুগ্‌লী জেলার বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুর নগরের অনতিদূরস্থিত কর্ণগড় নামক স্থানের রাজা যশমন্ত সিংহের সভাসদ্ ছিলেন। এই যশমন্ত সিংহ বিখ্যাত অজিত সিংহের পিতা ছিলেন। রামেশ্বরের শিবায়নে লিখিত আছে :—

"যশমন্ত নরনাথ, অজিত সিংহের তাত।"

কর্ণগড়ের রাজপ্রাসাদ ক্রমে ভগ্ন হইতেছে, আর কিছুদিন পরে তাহার কোন চিহ্নই থাকিবে না, কিন্তু রামেশ্বরের শিবায়নে তাহার অধিবাসীদিগের নাম চিররক্ষিত থাকিবে। কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তিনি সামান্য ব্যক্তি হইয়াও রাজাদিগকে অমরণ-ধর্ম্ম প্রদান করিতে পারেন। রামেশ্বরের ভাষা তত প্রাঞ্জল ও মধুর নহে; তথাপি স্থানে স্থানে তিনি মানবস্বভাব-বর্ণনে এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে এরূপ প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাঁহাকে নিতান্ত সামান্য কবি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। মেদিনীপুর গৌরব করিতে পারেন যে, তিনি রামেশ্বরের ন্যায় কবিকে এক সময়ে তাঁহার বক্ষে পোষণ করিয়াছিলেন। শিবায়ন ব্যতীত রামেশ্বর সত্যনারায়ণের পুথি রচিয়াছেন, তাহা অন্যান্য সত্যনারায়ণের কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাহার অনেক স্থানের বর্ণনা অতীব মনোহারিণী হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্ব স্থানে সত্যনারায়ণের পূজার সময় ঐ গাথা গীত হইয়া থাকে। তাঁহার সত্যনারায়ণ পুথি হইতে একস্থান উদ্ধৃত হইতেছে। স্বদেশে!

বহুকাল অনুপস্থিতির পর তৎসন্নিহিত নদীতীরে বণিকপত্নী চন্দ্রকলার পতির নৌকা লাগিবার সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পতি-বিরহ-বিধুরা চন্দ্রকলার শোক কবি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :——

"ধরিয়া মায়ের গলা, কাঁদে কন্যা চন্দ্রকলা,
স্বামি-শোকে হইয়া কাতর।
ম্লান হৈল মুখশশী, মনোরমা মুক্তকেশী,
না সম্বরে অঙ্গের অম্বর॥
হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় হানয়ে বুকে,
কপালেতে কঙ্কণ আঘাত।
ধৈরজ ধরিতে নারে, কেন্দে কহে উচ্চস্বরে,
কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ॥
হায় এ কি অকস্মাৎ, কোথা গেলে প্রাণনাথ,
একবার দরশন দেও।
না দেখিয়া তুয়া মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
অভাগীরে সঙ্গে করে লও॥
দেশে আইলে কত দিনে, বড় সাধ ছিল মনে,
আঁখিভরি দেখিব তোমারে।
তাহাতে দারুণ বিধি, হরিল হাতের নিধি,
বড় শেল রহিল অন্তরে॥
পতির মরণে যেন, রতির বিষাদ হেন,
কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ।
মায়ের বিদরে বুক, বাপে দশগুণ দুঃখ,
সবে কান্দি করে মনস্তাপ॥"

"বাপে দশগুণ দুঃখ"—কবি কি সত্যই বলিয়াছেন! শুনিতে পাই যে, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পুথির ন্যায় বঙ্গদেশে সত্যনারায়ণের ও শনির পাঁচালী প্রচলিত আছে,

কিন্তু তাহা আমি কখন শুনি নাই; অতএব তাহা কিরূপ, বলিতে পারি না।

এক্ষণে আমরা একটি ধর্ম্মসঙ্গীত-রচয়িতা সাধুপুরুষের নিকট আগমন করিতেছি। তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ ভাষায় রচিত এবং বঙ্গদেশে সর্ব্বস্থানে পরমার্থসাধক বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। তাঁহার নাম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাত-ভিখারীদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা বলা যায় না। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন। রামপ্রসাদ সেন ধর্ম্মসঙ্গীত ব্যতীত কালী-সংকীর্ত্তন ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর নামক কবিতাদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতের ন্যায় তাহা তত প্রসিদ্ধ নহে।

এই সময়ে সুবিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ ছিলেন। ইনি জীবনের শেষভাগে মূলাজোড় গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বংশাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে বিরচিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন :——

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। অনেক স্থানে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়া মাত্র। উদ্ভাবনী শক্তিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু রায় গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহার সন্দেহ নাই। মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানে যে তিনি কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন, ইহা বলা যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচাছোলা মাজাঘষা যে, বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিক্কণ নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন না :—

"পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি"

"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট"

তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ-মধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে :——

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"

"বড়র পিরিতি বালির বাঁদ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ"

কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উদ্ভাবনীশক্তি থাকিত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ বিদ্যা ও কুলশীল উভয়গুণ-

সম্পন্ন জামাতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই হইতেন। "গজদন্ত কনকে জড়িত।"

রায় গুণাকরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নাম ঘনরাম। তাঁহার গ্রন্থের নাম ধর্ম্মমঙ্গল গান। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিবার ৪২ বৎসর পূর্ব্বে ঘনরাম ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঘনরামের কবিতাতে স্বাভাবিক সারল্য ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই।

ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী-প্রণেতা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। গায়নেরা চামর ঢুলাইয়া ও মন্দিরা বাজাইয়া চণ্ডী ও রামায়ণ যেমন গান করিয়া থাকে, তেমনি এই কাব্যটিও গান করিয়া থাকে। আমার স্মরণ হয়, আমার বাল্যকালে আমার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-সম্পর্কীয় কোন ভক্তিভাজন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী ভক্তির সহিত পাঠ করিতেন। তখন বীটন সাহেব এদেশে আগমন করেন নাই ও স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাতও হয় নাই।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থই পদ্যে রচনা হইয়া আসিতেছিল, এই সময়ে গদ্যগ্রন্থ রচনা হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে রচনার বিষয়ানুসারে বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিষয় বলিব। সে সকল বিষয় এই ;—গদ্য, সাধারণ পদ্য, গীতিকাব্য, নাটক, উপন্যাস, শ্লেষাত্মক গদ্য-

কাব্য, সঙ্গীত, পুরাবৃত্ত, পুরাতত্ত্বানুসন্ধান, বিজ্ঞান, দর্শন,—আপনারা ভয় পাবেন না, এই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইবে,—মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পুস্তিকা, বক্তৃতারীতি, খৃষ্টানী বাঙ্গালা, মুসলমানী বাঙ্গালা, কয়েকটি ধর্ম্মের নিকট বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উপকৃত ভাব, বাঙ্গালা-ভাষার ক্রমোন্নতির কালবিভাগ, বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান ও ভাবী অবস্থা।

অনেকে মনে করেন যে, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা-ভাষার প্রথম গদ্যগ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহাকর্ত্তৃক বাঙ্গালায় গদ্যগ্রন্থ লিখিত হইবার পূর্ব্বেও কতিপয় গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের ভাষা ভাল নহে। ইংরাজী ১৮০৬ সালে প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রকাশিত হয়। উহা রামরাম বসু দ্বারা কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে প্রণীত হইয়াছিল। রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের ভাষা অতি কর্কশ। ১৮০৫ সালে কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত্র প্রকাশিত হয়। উহাও কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে ঐ কালেজের অন্যতর শিক্ষক রাজীবলোচন দ্বারা প্রণীত হয়। ১৮০৮ সালে রাজাবলী ও ১৮১৩ সালে প্রবোধ-চন্দ্রিকা ঐ কালেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক উৎকল-দেশ-জাত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রবোধ-চন্দ্রিকার অনেক স্থল যে প্রকার উৎকট সাধুভাষায় লিখিত, তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে :—"কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ

নির্ঝরান্তঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।” ১৮১৪ সালে পুরুষ-পরীক্ষা প্রকাশিত হয়। উহা বিদ্যাপতিপ্রণীত ঐ নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ১৮৩০ সালে কলিকাতার তদানীন্তন লর্ড বিশপ টর্নর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে পুরুষ-পরীক্ষা রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের দ্বারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। ঐ অনুবাদ সাহেবমহলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠার মূল। উল্লিখিত গ্রন্থ সকল এমন অপ-কৃষ্ট ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের স্থষ্টিকর্ত্তা বলিলে অন্যায় হয় না। তিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের জনয়িতা। ১৮১৬ সালে রাজা রামমোহন রায় দশোপনিষদ বাঙ্গালা গদ্য ভূমিকার সহিত প্রকাশ করেন। সেই অবধি তিনি অনেক বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচারবিষয়ক। ইহার একখানি গ্রন্থ সহমরণের বিপক্ষে। সহমরণের পক্ষের লোকেরা তাঁহাদিগের একখানি গ্রন্থে আমাদিগের দেশের বেচারী স্ত্রীলোকদিগের উপর নানাপ্রকার অযথাদোষারোপ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাহাদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার গদ্যভাষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে :——

“পঞ্চম, তাহাদের ধর্ম্মভয় অল্প। এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কিপর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পোনের বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপিও ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ

ব্যতিরেকে এবং স্বামীদ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্মনির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাসীবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদিপাত্রমার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এসকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিককাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইঁহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদিগের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজনাবশেষে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণকায়স্থ, যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোকসকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন; রাত্রিতে শয্যাদি যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে একদিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম-

ভয়ে এ সকল সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদিগের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"*

"পুরুষের প্রাবল্য হেতু" এই প্রয়োগে বিশেষ রস আছে। এই প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোধ হয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও নহেন। এই স্থানে রামমোহন রায় তাঁহার বরাঙ্গিণী মোয়াক্কেলদিগের জন্য যেরূপ লড়িয়াছেন, এমন প্রায় অন্য কাহাকে দৃষ্ট হয় না।

সুখের বিষয় এই যে, রামমোহন রায় আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা এই অৰ্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা আর একপ্রকার একশেষে যাইতেছেন। সে কালের

---

* রাজা রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে স্থানে স্থানে গুরু কর্ত্তার ইতর ক্রিয়া ও ইতর কর্ত্তার গুরু ক্রিয়া ও সর্ব্বনাম আছে। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতু এইরূপ হইয়াছে।

স্ত্রীলোকেরা যেমন গৃহকার্য্যে পরিশ্রম-তৎপর ছিলেন, এক্ষণকার স্ত্রীলোকদিগকে সেরূপ দেখা যায় না।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর একাদশ বৎসর পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দ্বারা যে বঙ্গভাষার বহু উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বাদশ বৎসর উহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে পত্রিকাতে যে সকল প্রস্তাব লিখেন, তাহা বঙ্গভাষাকে অতি সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছে। অক্ষয় বাবুর প্রণীত বাহ্যবস্তু ও ধর্ম্মনীতি তাঁহার সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য, পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষা, কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি তাঁহার স্বকপোল-রচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্ব্বোত্তম রচনা। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা এখনো স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়বাবু বর্ত্তমান বঙ্গভাষার একজন প্রধান নির্ম্মাতা।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার জন্‌সন্‌ স্বরূপ বিজ্ঞাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থ সকলের দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া

দিতেন। অক্ষয়বাবু কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী-শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ-বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল-রচনা-শক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার সময় তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরাজীওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর-রচিত বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্ম্মাণ ও পরিমার্জ্জন-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছে।

বিদ্যাসাগরের ইদানীন্তন ভাষা যেমন সহজ, কোমল ও মসৃণ হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তিনি সংস্কৃত-শব্দ-বহুল সাধুভাষা ব্যবহার করাতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার ও শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ সালে অপ-ভাষায় লিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহার নাম "মাসিক পত্রিকা।" ঐ পত্রিকার প্রতিসংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন থাকিত। সেই বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি

লেখা থাকিত, "এই পত্রিকা পণ্ডিতলোকদিগের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। তাঁহারা পড়্তে চান পড়্বেন, কিন্তু তাঁদের জন্য এ পত্রিকা নহে।" ঐ পত্রিকায় টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ কল্পিত টেকচাঁদ ঠাকুর আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র। সেই অবধি দুই প্রকার ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা। কোন্ ভাষা জয়লাভ করিবে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে সন্দেহ ছিল। এক্ষণে যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐ দুই ভাষা হইতে উৎপন্ন এক মিশ্র ভাষা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্তপ্রদর্শক বিখ্যাত উপন্যাস-রচয়িতা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এমন এমন বিশেষ বিষয় আছে, যাহাতে হয় কেবল বিদ্যাসাগরী ভাষা, নয় কেবল আলালী ভাষা চিরকাল ব্যবহৃত হইবে। পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত কিম্বা বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলে বিদ্যাসাগরী ভাষা অবলম্বন করিতেই হইবে, আর শ্লেষাত্মক গদ্য কাব্য, কিম্বা হাস্যকর উপন্যাস কিম্বা নাটক লিখিতে হইলে আলালী ভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে।

"আলালী ভাষা" এই প্রয়োগ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষাসম্বন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে বলিয়াছেন, "আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতুম পেঁচা বল, মৃণালিনী বল, পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের

সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি, কিন্তু পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই এ সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। * * * * অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কি না?—আমাদিগের বোধে উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মোণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়,—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুম্‌ড়োর খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফল কথা এই, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার; এক-বিধ রচনা পাঠে সর্ব্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নয়। অতএব ভাষার মধ্যে নানা-প্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘু বিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণকার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়।”

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর-ঘটিত একটি অতীব কৌতুক-জনক স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা গেল না। টেকচাঁদ ঠাকুর বাবুরামের শ্রাদ্ধ-বর্ণনে লিখিয়াছেন, "দিনরাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন যেন গো-মড়কে মুচির পার্ব্বণ।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন নিজে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, অতএব তিনি টেকচাঁদ ঠাকুরের এই উক্তিতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা বহুবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করেন, চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহস্র ক্লেশভোগ করিয়াও তাহা করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন। অধ্যাপনার প্রণালীও এদেশে স্বতন্ত্ররূপ,—ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়া পড়াইতে হয়। বিদ্যাধ্যাপনের এরূপ উদার রীতি বোধ হয় কোন দেশে নাই। অধ্যাপকেরা বৈষয়িক সুখে বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞান বিতরণ কার্য্যেই সর্ব্বদা নিরত থাকেন, এইজন্য তাঁহাদের আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দেশীয় ধার্ম্মিক বিজ্ঞলোকেরা শ্রাদ্ধবিবাহাদি সকল কার্য্যের উপলক্ষেই তাঁহা-দিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া থাকেন। তাহাই অধ্যাপক-দিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। তদ্দ্বারা তাঁহারা পরিবারদিগের কথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারি-লেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া অভিলষিত কার্য্যে চিরজীবন যাপন করেন। অতএব আমাদিগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের ন্যায় শ্লাঘ্যকর্ম্মা ও উদারাশয় পণ্ডিত কোন্ জাতির মধ্যে কত আছেন? যদিও উৎসাহবিরহাদি নানা কারণে এক্ষণে সকল

ব্রাহ্মণপণ্ডিতে নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন না, তথাপি সাধারণ্যে ঐ শ্রেণীস্থ লোকের উপর প্রাচীন ও নব্য, উভয় তন্ত্রেরই কৃতবিদ্য বিজ্ঞলোকদিগের অদ্যাপি বিলক্ষণ গৌরববুদ্ধি আছে, যেহেতু তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে একদল ঐরূপ মহেচ্ছু লোক আছেন, এজন্য ভিন্নজাতীয়-দিগের নিকট গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু পাঠকগণ দেখুন, হিন্দুজাতির গৌরবস্থল সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি টেকচাঁদবাবু কিরূপ বিজ্ঞোচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া-ছেন।” পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তৎপরে বলিতেছেন, “কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর কেন, ব্রাহ্মণজাতির প্রতি টেকচাঁদবাবুর কিছু বিদ্বেষ আছে বোধ হয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গোষ্ঠীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, ‘বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা, সকল সময়ে সব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারে না, ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকৃড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়-শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয় ইত্যাদি’—এক্ষণে টেকচাঁদবাবুর প্রতি জিজ্ঞাস্য এই, ন্যায়শাস্ত্র বোঝা কি মোটা বুদ্ধির কর্ম্ম? এপর্য্যন্ত এই মোটা বুদ্ধির ব্রাহ্মণ ভিন্ন কয়জন সরুবুদ্ধি ইতর-জাতীয় লোক ন্যায়শাস্ত্র বুঝিতে পারিয়াছেন? এদেশে ব্রাহ্মণেরাই চিরকাল শাস্ত্রচর্চ্চা ও বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া-ছেন। অতএব তাঁহাদের সন্তানেরা সাধারণ্যে অপরিশীলিত বুদ্ধি ও অন্যান্য জাতীয়দিগের সন্তানগণ অপেক্ষা অধিক মোটাবুদ্ধি হইবেন, তাহার সম্ভব নয়।” পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ। কিন্তু শ্লেষা-ত্মক গদ্যকাব্য-প্রণেতারা কত কি বলিয়া থাকেন, তাহা খণ্ডন

করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইবার আবশ্যক কি ? টেকচাঁদ ঠাকুরের উক্তি অপেক্ষা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের খণ্ডন আরও কৌতুক-জনক হইয়াছে, বিশেষতঃ যেখানে তিনি "পাঠকবর্গ দেখুন" বলিয়া পাঠকবর্গ-সমীপে আপীল করিয়াছেন, সেই স্থান আরও কৌতুক-জনক হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকটেও বঙ্গভাষা বিশেষ উপকৃত আছে। তিনি বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। উহা বিদ্যা-রত্নের একটি খনিস্বরূপ। তিনি প্রাকৃতিক ভূগোল প্রকাশ করিয়াও বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ভাষা অনেক পরিমাণে ঋণী আছে। তিনি উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে সম্পাদিত সম্বাদপত্র প্রকাশ ও অনেক নূতন শব্দের ও প্রয়োগের সৃষ্টি করিয়া ভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে পুরাবৃত্ত রচনা করেন।

এক্ষণকার গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রধান। ইহাঁর বিষয় আমরা পরে বলিব।

গদ্য ছাড়িয়া তৎপরে আমরা সাধারণ পদ্য-বিভাগে প্রবেশ করিতেছি। এই বিভাগে ভারতচন্দ্রের পর আমাদিগের দৃষ্টি প্রথমতঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কারে প্রতি নিপতিত হয়। ইহাঁর প্রধান গ্রন্থ বাসবদত্তা। [illegible] অনেক সংস্কৃত কবি ও ভারতচন্দ্রের অনুকরণে প[illegible] তথাপি

তর্কালঙ্কার মহাশয় স্থানে স্থানে যে কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সামান্য কবি বলিয়া বোধ হয় না, বিশেষতঃ যখন বিবেচনা করা যায় যে, তিনি একুশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আরও প্রশংসা করিতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রহস্যজনক কবিতাতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি পাঁটার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাঁটার সাদা ও কাল ছানাগুলিকে কানাই বলায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। কানাই বলাই যেমন গোষ্ঠে খেলা করিয়াছিলেন, ইহারাও মাঠে সেইরূপ খেলা করে। তিনি ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই বাক্য আছে :—

"মুরগির আণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা,
খেয়ে কর প্রাণ ঠাণ্ডা।"

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সম্বন্ধে তিনি এক কবিতা লেখেন, তাহাতে এই বাক্য আছে :—

"মাথামুণ্ডু ঘুরে গেল মাথামুণ্ডু লিখে।"

গরীব যে আমি, আমার সম্বন্ধেও লিখিয়াছিলেন :—

"বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।"

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা অতীব রহস্যজনক; তাহাতে মার্শম্যান সাহেবকে শিবরূপে এবং তাঁহার সহকারী সম্পাদক টাউনষেণ্ড ও রবিন্‌সন সাহেবদিগকে নন্দী ও ভৃঙ্গী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নন্দী এক্ষণে

বিলাতে গিয়া Spectator নামক তথাকার বিখ্যাত সম্বাদ-পত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন; ভৃঙ্গীটি এখনও এখানে আছেন, তিনি এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেটের সম্পাদক। ঐ গেজেটে গবর্ণমেণ্ট আইনের যে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহারই। ঐ অনুবাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি চমৎকার!

রামরসায়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী একজন সামান্য কবি নহেন। ইনি দক্ষিণদেশবাসী ছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেনের নিকট সর্ব্বদা আসিতেন।

মাইকেল মধুসূদনরূপ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কালের প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের প্রভার নিকট তাঁহার প্রভা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। রঙ্গলাল বাবুর কবিতাতে সহৃদয়তাগুণ অধিক নাই, কিন্তু তিনি একজন অতি উৎকৃষ্ট কবি, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যান প্রধান।

ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের প্রণীত "সদ্ভাবশতক" অতীব মনোহর। তাহা পারস্য কবি হাফেজকে আদর্শ করিয়া লিখিত, কিন্তু উহা হাফেজের হীন অনুকরণ নহে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা প্রদেশীয় অন্যতর বিখ্যাত কবি।

এক্ষণে আমরা মাইকেল মধুসূদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠকি! মাইকেল মধুসূদনের যেমন গোঁড়াও অনেক, তেমনি শত্রুও অনেক। তাঁহার

সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল। তিনি কলেজে আমার সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আমি মেদিনীপুরে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদা পত্র লেখা হইত; সেই সকল পত্র আমার নিকট আছে; তাহা অতীব কৌতূহলজনক। যখন আমি ঐ স্থানে ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য ছাপাইবার পূর্ব্বে তাহার প্রথম দুই সর্গ আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া যেখানে যেখানে দোষ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত তিনি আমাকে "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" সংবাদপত্রে তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রার্থনামতে আমি ঐ কাব্য উক্ত পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষগুণ বিচারের সময় বন্ধুতাভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত হইতে দেওয়া উচিত নহে। আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষে গুণে, মাইকেল মধুসূদনও তেমনি দোষে গুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষ ও গুণ আছে, কিন্তু "দোষে গুণে কবি" এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন তাঁহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করুণারসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন

সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা দেয়। আর্য্যকুল সূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করাণো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল; যথা,—হোমর ও বাল্মীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিণ্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিণ্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দ-বিন্যাসের রাজ-গাম্ভীর্য্য ও রচনার জম্‌জমাট্ দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিণ্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়। "যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে" "নাদিল দম্ভোলি কড় কড় রবে" ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগদ্বারা মাইকেল মধুসূদনের

কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদ-বধ কাব্যের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে মাইকেল মধুসূদন "খেদাইনু" "নাদিলা" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি "রামভদ্র" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিনী, শকুনী ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্ত্তনা দ্বারা শান্তিরসের ভঙ্গ করা হইল। কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষসত্ত্বে কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি? মেঘনাদবধ ব্যতীত বীরাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী-কবিতা প্রভৃতি তাঁহার অন্য সকল কবিতাও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তির অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নবপ্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দোষ সকল স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।*

---

* এই বক্তৃতা করিবার পর আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য মাইকেল মধুসূদনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয়

কয়েক বৎসর হইল, অমৃতবাজার-পত্রিকায় "ছুচ্ছুন্দরী-বধ কাব্য" নামে মাইকেল মধুসূদনের রচনার একটি হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। আমি ইংরাজীতে হোমর প্রভৃতি কবির হাস্যকর অনুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর অনুকরণটি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকে এইরূপ মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচনা করেন, তিনি কবির অমর্য্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :——

"ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য।

দ্রুহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে,—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিলা ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখরপ্রহারে,
যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্ক্কস্কারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত
সু আশুগ ইরম্মদ গমে সনসনে)

পক্ষীয় লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বলিয়াছি।

. চতুষ্পদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ সম
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে। হায় রে! যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভুজাকাছে,—
(ক্ষ্মাভ্রীশ আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহুঃ দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণুপরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারুবিনির্ম্মিত দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরি সঙ্কীর্ত্তনে।"

এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারতসঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে। তাঁহার রচিত ভারতসঙ্গীতে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর গুরু মাধবাচার্য্য বলিতেছেন:——

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বিংশতিকোটি মানবের বাস
ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

*   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতি তেমনি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ি লুটাও।

অই দেখ! সেই মাথার উপরে
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল;

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

আমার মতে হেমচন্দ্র বাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

১

"ঋষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন
করি একদিন বসিলা ধ্যানে,
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা
কহিতে লাগিলা আসি সেখানে ;—

২

নাথ ঋষিগণ সমূলে নিধন
মানবসংসার হলো এবার,
হলো ছারখার ভুবন আমার,
অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর।

৩

শুনে ঋষিগণ করে দৃঢ় পণ
যোগে দিল মন একান্ত চিতে ;
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম আরাধনা
করিতে লাগিল মানবহিতে।

৪

মানব মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ;
মানবে রাখিতে নারায়ণচিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

৫

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগনমণ্ডল তিমিরময়,
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

৬

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিত প্রায়,
নিবিড় আঁধার জলধিহুঙ্কার
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

৭

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে,
নদনদীজল হইল অচল
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

৮

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয় ;
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।

৯

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়
ব্রহ্মসনাতন অতুল চরণ
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়।

১০

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী,
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে,
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

১১

হায়! কি অপার আনন্দ আমার,
ব্রহ্মসনাতন চরণ হতে
ব্রহ্মা কমুণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।”

নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, বর্ত্তমান কালের অন্যতর প্রসিদ্ধ কবি। ইহাঁদের মধ্যে কোন কোন সাহিত্য-রসাভিজ্ঞ ব্যক্তি নবীনচন্দ্র সেনকে এক্ষণকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কবি বলিয়া গণ্য করেন। কেহ কেহ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীকে ঐ পদ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা আপনাদিগের অভিপ্রায় পক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান, তাহা নিতান্ত ক্ষীণ বোধ হয় না। আমি বিহারীবাবুর গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া তাঁহাকে “দুঃখের কবি” এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম, তিনি যেমন দুঃখ ও মানসিক কষ্ট বর্ণনা করিতে পারেন, তেমন অন্য কোন বর্ত্তমান কবি পারেন না।

গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙ্গালা কবিতার গতির উপমা দেওয়া যাইতে পারে। গঙ্গা যেমন বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত

হইয়াছে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া হিমালয় প্রদেশে যেখানে প্রকৃতিদেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়দুহিতা পার্ব্বতীর কীর্ত্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডী মহাকাব্যে বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করতঃ মহামায়ার অদ্ভুত কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। গঙ্গা যেমন বিঠুর গ্রামের সন্নিহিত হইয়া এক দিকে বাল্মীকির তপোবন ও অন্য দিকে রামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান অযোধ্যাপ্রদেশ, দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণ গান করিয়া ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের কীর্ত্তিস্থান দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিতা মধ্যকালে কৃষ্ণার্জ্জুনের গুণকীর্ত্তনকারী কাশীরাম দাসের মহাভারতরূপ শাখানদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালাকবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর, অন্যদিকে

চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কলিকাতা, ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইউরোপীয় কীর্ত্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা অধুনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালা কবিদিগের গ্রন্থে ইউরোপীয় সুন্দর, কিন্তু বঙ্গপ্রকৃতি-বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছে। গঙ্গা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মহাকল্লোলসমন্বিত বেগে সমুদ্রসমাগম লাভ করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালাকবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী, উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও ওজস্বী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

সাধারণ পদ্যবিভাগ ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমরা তাহার একটি বিশেষ শাখা অর্থাৎ গীতিকাব্যের বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। রামপ্রসাদসেনের পর গীতরচনায় নিধিরাম গুপ্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম গীতরত্ন গ্রন্থ। উহা সচরাচর “নিধুর টপ্পা” নামে প্রসিদ্ধ। নিধুবাবু ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিধুবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি বাণিজ্যাগারে কর্ম্ম করিতেন। কথিত আছে যে, তিনি ঐ বাণিজ্যাগারে যে ডে-বুক রাখিতেন, তাহাতে এক দিন একটি টপ্পা লিখিয়াছিলেন। নিধুবাবুর রচিত গীতে মধ্যে মধ্যে চমৎকার ভাব আছে :—

“নির্ভয় শরীর মোর,
উল্লাসিত অন্তর,
হৃদয়ে উদয় সদা প্রেম পূর্ণচন্দ্র।”

এই বাক্য মানবীয় প্রেম অপেক্ষা ঐশী প্রেমের প্রতি আরো অধিক খাটে।

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?"

"যদি সুখী হইবে, হে মন রাজন!
অহঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারণ।"

নিধুবাবুর পর কবিওয়ালাগণ গীতরচনা-বিষয়ে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। নিধুবাবু নিজেও একজন কবিওয়ালা ছিলেন। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু নরসিং ও রাম বসু প্রধান। হরু ঠাকুরের গীতগুলি অতি উৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার রচিত অধিকাংশ গীত আর পাওয়া যায় না। রাম বসুর বিরহ আমাদের দেশে অতি বিখ্যাত। অন্তর ও বাহ্যজগৎ বর্ণনে রাম বসুর যেরূপ নৈপুণ্য দেখা যায়, এমন বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প-সংখ্যক কবির দেখা যায়। রাম বসুর গীতগুলি যেন স্বভাবের হস্ত হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বহির্গত হইয়াছে, এমনি বোধ হয়। হরু ঠাকুরের বিষয়ে যে আক্ষেপ করা গেল, রাম বসুর সম্বন্ধে সেই আক্ষেপ করা যাইতে পারে। তাঁহার অনেক-গুলি গীত লোপ পাইয়াছে। আমার রচিত "সেকাল আর একাল" গ্রন্থে হরু ঠাকুর ও রাম বসুর কবিতা উদ্ধৃত করি-য়াছি। কবিওয়ালাগণ ব্যতীত অন্যান্য গীতরচকেরা বাঙ্গালা ভাষার অল্প উপকার সাধন করেন নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "কলিকাতার ঠন্‌ঠনে নিবাসী লক্ষ্মী-কান্ত বিশ্বাসের ও শোভাবাজারনিবাসী গঙ্গানারায়ণ লস্করের

পাঁচালী, পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত তাবাগ্রামনিবাসী পরমানন্দ অধিকারীর তুক্ক, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেলডাঙ্গানিবাসী রূপ অধিকারীর ঢপ, বর্দ্ধমানান্তঃপাতী চুপীগ্রামনিবাসী রঘুনাথ রায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও নরচন্দ্রের শ্যামাবিষয় গীত, উলুসে গোপালনগরনিবাসী মধুসূদন কানের কীর্ত্তন, বাঁশবেড়ে নিবাসী শ্রীধর কবিরত্নের আদিরস-সংক্রান্ত গীত, গোপাল উড়ে, গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, বদনচন্দ্র অধিকারী, নীলকমল সিংহ, দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, মদনমোহন মাষ্টার প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত, এ সকলও বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনপক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই। আমরা বাহুল্যভয়ে এ সমস্তে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া দুঃখিত রহিলাম।” পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার অত বড় গ্রন্থে যে ভয়ে ঐ সমস্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, আমিও ঐ ভয়ের আধিক্যবশতঃ একটি সামান্য বক্তৃতায় ইহাঁদিগের বিষয় অধিক বলিতে পারিলাম না।

কিন্তু আমরা একটি বিশেষ গীতরচয়িতার বিষয় কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার নাম দাশরথী রায়। দাশু রায়ের পাঁচালী এদেশে বিখ্যাত। উহা সহজ ও কোমল সুরে রচিত এবং উহার মধ্যে কোনটা হাস্যরসের উদ্রেক এবং কোনটা করুণারসের উদ্দীপনা করে বলিয়া উহা আমাদিগের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু উহার মধ্যে অনেকগুলি অশ্লীলতাদোষে এত দূষিত যে, তাহা ভদ্রসমীপে পাঠ করা যায় না।

ধর্ম্মসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কেও গীতরচকদিগের মধ্যে এক প্রধান আসন দেওয়া যাইতে পারে। শুনা যায় যে, রামমোহন রায় প্রথমে কবি হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতচন্দ্রের গুণগরিমা দেখিয়া তাঁহার সমান হওয়া অসাধ্য মনে করিলেন এবং নিরাশ-পঙ্কে পতিত হইয়া কবিতা রচনা কার্য্য হইতে একেবারে বিরত হইলেন। তাঁহার রচিত গীতের মধ্যে স্থানে স্থানে অল্প কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হয় নাই :—

"অশ্রু পড়ে বাসনার, দন্ত করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।"

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।"

ডাক্তারব্যবসায়ী কলিকাতার একজন দুর্দ্ধর্ষ নাস্তিক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি এই গান শুনিলেন, তখন তাঁহার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত একেধারে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত. শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি পরম মনোহর ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়া স্বজাতিকে চিরসম্পত্তি দান করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়েও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সে

বিষয় স্বদেশপ্রেম। তাঁহার রচিত শেষোক্ত প্রকার একটি সঙ্গীত আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি :—

"মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশো গান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান।

হোক ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয় ?
গাও ভারতের জয়!

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয় ?
গাও ভারতের জয়!

বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি, মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী;
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির?
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?
পৃথুরাজ আদি বীরগণ;
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু, দুষ্টের দমন।

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

কেন ডর ভীরু! কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়;
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

বঙ্গদর্শন আমার প্রণীত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সমালোচনা সময়ে ঐ গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত সত্যেন্দ্র বাবুর এই গীতটি আমার রচিত মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"

অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করেন যে, ধর্ম্ম ও আদিরসঘটিত গীত* ব্যতীত বন্ধুতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালাভাষায় অদ্যাপি গীত রচিত হয় নাই, কিন্তু এ আক্ষেপ অনেক পরিমাণে না হউক, কিয়ৎপরিমাণে অমূলক। সত্যেন্দ্রবাবু স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক কতকগুলি গীত রচনা করিয়া এ অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়াছেন। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী "সঙ্গীতশতক" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নানা বিষয়ের সঙ্গীত আছে। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় "গীতহার" নামে

* দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের আদিরসঘটিত অনেক গীত অশ্লীলতা ও অবিশুদ্ধ প্রেমদ্বারা কলুষিত।

ঐ প্রকার এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গীতগুলি কিন্তু তত উৎকৃষ্ট ও মনোহর নহে। জাতীয় সঙ্গীত নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক অতি উৎকৃষ্ট সংগীত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা নাটক-বিভাগ ধরিতেছি। ভদ্রার্জ্জুন নাটক বাঙ্গালাভাষার প্রথম প্রকাশিত নাটক। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালাভাষার দ্বিতীয় নাটক রচনা করেন। সে নাটকের নাম "ভানুমতী-চিত্ত-বিলাস", তাহা সেক্সপিয়ারের "মর্‌চেণ্ট অব্ বেনিস" নামক নাটককে আদর্শ করিয়া লিখিত। গম্ভীরভাবের প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও আমাদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে; রাম-নারায়ণ তর্করত্ন ও দীনবন্ধু মিত্র তাহাদের প্রণেতা। ইহার মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদিগের প্রণীত গম্ভীর নাটকের যে স্থানে হাস্যরসের বর্ণনা আছে, সেখানে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। গম্ভীরনাটক-রচয়িতাদিগের মধ্যে নবীন তপস্বিনী ও লীলাবতী নাটকপ্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী-নাটক-প্রণেতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিধবাবিবাহ-নাটক-প্রণেতা উমেশচন্দ্র মিত্র, নবনাটক-প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন, রামাভিষেক ও সতী-নাটক-প্রণেতা মনোমোহন বসু, পুরুবিক্রম এবং সরোজিনী-নাটকপ্রণেতা সাধারণের অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি, শরৎসরো-জিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক প্রণেতা উপেন্দ্রনাথ দাস

এবং কুলীনকন্যা-প্রণেতা লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রধান। মনোমোহন বসুর অন্তর্জগৎ বর্ণনাতে যেমন পারগতা আছে, বাহ্যজগৎ বর্ণনাতে তেমনই পারগতা আছে। তাঁহার প্রণীত "পদ্যমালা" পুস্তক শিশুদিগের জন্য লিখিত; বয়স্ক লোকে তাহার অল্প সংবাদই রাখেন, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এরূপ বাহ্যজগৎ বর্ণনানৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আধুনিক অতি অল্প বাঙ্গালা কবিতাতে সেরূপ দৃষ্ট হয়। প্রহসন-মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে পঙ্গপালের ন্যায় নাটক বহির্গত হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ নাটকের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা বলিতেন, তাহা খাটে,—"না টক না মিষ্টি।"

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে যেমন নাটক পঙ্গপালের ন্যায় বহির্গত হইতেছে, তেমনি উহা উপন্যাসও ক্রমিক প্রসব করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থাকিলে হয় ত বলিতেন, উপন্যাস নামই তাহাদের উপযুক্ত। উহাদিগের অধিকাংশ উপন্যাস অর্থাৎ খারাব সাজান গল্পগুলি; তাহাদের প্রণেতারা গল্প ভাল সাজাইতে পারে না। তাহাদিগকে যদি নবন্যাস বলিয়া ডাকা যায়, তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত থাকিলে বোধ হয় বলিতেন যে, নবন্যাস নাম তাহাদের অনুপযুক্ত অর্থাৎ সে সকল নূতন সাজান নহে। তাহাতে উদ্ভাবনী শক্তি অতি অল্পই প্রকাশিত আছে। শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্বসম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা

উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিঃসৃত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম "বিজয় বল্লভ," কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস বিভাগে অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি সেই অতুল খ্যাতির সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। যেহেতু তাঁহার ন্যায় উপ-ন্যাস-রচয়িতা বাঙ্গালাভাষায় আর নাই। কিন্তু কোন কোন লোক যে বলে, তিনি "বেঙ্গলি সার ওয়াণ্টার স্কট", তাহাতে আমার ঈষদ্ধাস্য পায়। মেসায়া নামক বীররসের কাব্য-প্রণেতা জর্ম্মণ কবি ক্লপষ্টককে লোকে জর্ম্মণ মিণ্টন বলিয়া ডাকিত, তাহাতে ইংরাজী কবি ও তত্ত্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত কোল-রিজ্ বলিয়াছিলেন, "German Milton indeed!"। সেইরূপ বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি, "Bengalee Sir Walter Scott indeed!"। লোকে যাহা বলুক, বঙ্কিম বাবুর প্রকৃতি আমি যতদূর জানি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তিনি নিজে এরূপ উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন। কেহ কেহ মাইকেল মধুসূদনকেও মিণ্টনের ন্যায় কবি বলিয়া মনে করেন, এতৎসম্বন্ধেও আমি বলিতে পারি, Bengalee Milton indeed!। আমি মেদিনীপুরে থাকিতে মাইকেল মধুসূদন নিজে আমাকে লিখিয়াছিলেন :—

"The poem Meghnadhbadha is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton, but that is all bosh. Nothing can be better than Milton. Many say it licks Kalidas. I have no objection to that, I do not think it impossible to

equal Virgil, Kalidas and Tasso, Though glorious, still they are mortal poets. Milton is divine."

মিল্টন ও সার ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় কাব্যকার সচরাচর জন্মে না। বঙ্গদেশে যে কখন মিল্টনের ন্যায় কবি অথবা স্কটের ন্যায় উপন্যাসরচয়িতা জন্মিবে না, এমন আমি বলিতেছি না। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন মিল্টন অথবা বঙ্কিমবাবু সার ওয়াল্টার স্কট নহেন। বঙ্কিমবাবু সার ওয়াল্টার স্কটের তুল্য না হউন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় উপন্যাস-রচয়িতা, তাহার আর সন্দেহ নাই। কোন কোন স্থানে তাঁহার বর্ণনা সুসঙ্গত নহে এবং কোন কোন স্থানে জাতীয় ভাবের অভাব আছে, অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিরা আমাদিগের হিন্দু-জাতির রীতি নীতি অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারেন না,—তথাপি মানবস্বভাব বিশেষতঃ উচ্চপ্রকৃতির স্ত্রীলোকের স্বভাব স্বভাবানুযায়ী চিত্রিত করিতে বঙ্কিমবাবুর ন্যায় আমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ? উপন্যাসরচয়িতা বলিয়া "স্বর্ণলতা" প্রণেতা অল্প খ্যাতি লাভ করেন নাই। তাঁহার রচিত উপন্যাসের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাহার কোন স্থানে জাতীয় ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। "বঙ্গবিজেতা" প্রণেতা সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত এই বিভাগে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। "বঙ্গাধিপ পরাজয়" নামক উপন্যাসে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পুস্তক এমন দীর্ঘায়ত যে, তাহা পাঠের জন্য মনুষ্যের অল্পায়ু কুলিয়া উঠে না।

একণে আমরা শ্লেষাত্মক গদ্য-কাব্যবিভাগে প্রবেশ করিতেছি। টেকচাঁদ ঠাকুর এ প্রকার কাব্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকলে মানবস্বভাব-পরিজ্ঞান বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাঁর বিষয় পূর্ব্বে আমরা অনেক বলিয়াছি। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুমপেঁচার নক্সায় বিলক্ষণ হাস্য-রস-উদ্দীপনী শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নক্সাগুলি জলজ্যান্ত বোধ হয়। সম্প্রতি ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পতরুনামক একখানি শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার চিত্রগুলিতে নিতান্ত অল্প ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই।

সঙ্গীত-বিভাগে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হিন্দু সঙ্গীতের উন্নতিজন্য আমরা শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট বিশেষ উপকৃত আছি। ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গীত বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাহার অনাদর করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তাহা অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। কাপ্তেন উইলার্ড এবং লামার্টিনিয়রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আল্‌ডিস সাহেব ইহার দৃষ্টান্ত।

পুরাবৃত্ত-বিভাগে কেবল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম শ্রেণীর পুরাবৃত্ত এখনও আমাদিগের ভাষায় লিখিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পুরাতত্ত্বানুসন্ধান,—ইংরাজীতে যাহাকে Antiquities বলে,—সে

বিভাগকে আপনাদিগের স্বস্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। এবিষয়ে রাজেন্দ্রলালবাবু ও অক্ষয়বাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর এবিষয়ে রামদাসবাবু ও রজনীবাবুর গ্রন্থ সকল প্রশংসা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান-বিভাগে কেবল পদার্থ-বিদ্যা-প্রণেতা অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রাকৃতিক ভূগোলপ্রণেতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানপ্রণেতা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং পদার্থদর্শন-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এগুলির অধিকাংশ অনুবাদ মাত্র। এখনও বাঙ্গালী জাতি স্বাধীন ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে সমর্থ হয় নাই।

দর্শনবিভাগে রামমোহন রায়, আত্মতত্ত্ববিদ্যা-প্রণেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং তত্ত্ববিদ্যা-প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বেদান্তদর্শনের অর্থ করিয়াছেন, রামমোহন রায় আপনার স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ইহা দ্বারভাঙ্গা-প্রবাসী চন্দ্রশেখর বসু তাঁহার বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। বঙ্গদর্শন নামক সাময়িক পত্রিকায় দর্শন বিষয়ক সূক্ষ্মবুদ্ধিমত্তা-সূচক (কেহ কেহ বলিবেন অতিবুদ্ধিসূচক) কতকগুলি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতা, নাটক ও উপন্যাস বিভাগ ছাড়িয়া যতই আমরা পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগের দিকে আসিতেছি, ততই গ্রন্থকারের সংখ্যা আস্তে আস্তে অতি সুন্দর-

রূপে কমিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীরা টপ্পা রচনাতে যত পটু, এই সকল গুরুতর বিষয় রচনাতে তত পটু নহে।

আমরা যেরূপ বিষয় বিভাগ করিয়াছি, তাহাতে এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের পুরাবৃত্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে হয়। প্রায় এক-শত বৎসর হইল, নেথ্যানিয়েল হ্যালহেড নামক এতদ্দেশ-হিতৈষী উচ্চপদস্থ একজন সাহেব ইংরাজী ভাষায় একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে উদাহরণগুলি ছাপাইবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তখন ছাপার বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার বন্ধু মহাত্মা চার্লস্ উইলকিন্স সাহেব—ইনি পরে সার চার্লস্ উইল-কিন্স হইয়াছিলেন এবং ইংরাজীতে ভগবদ্‌গীতা অনুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন,—ইংরাজী ১৭৭৮ সালে স্বহস্তে একসাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। সেই প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। তাহার পর শ্রীরামপুর মিস-নরিরা উক্ত মুদ্রাযন্ত্র বিলক্ষণরূপে উন্নত করেন। তাঁহাদিগের মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত অতি পরিষ্কার-রূপে প্রথম ছাপা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার আপনার মনোমত ঐ দুই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া গরীব কৃত্তি-বাস ও কাশীরাম দাসের একেবারে দফা খাইয়াছেন। সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকৃত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ছাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

১৮১৬ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য "বেঙ্গল-গেজেট" নামক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই গঙ্গাধর

ভট্টাচার্য্য সচিত্র অন্নদামঙ্গল ও অন্যান্য পুস্তক ছাপাইয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সাহেবদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-সাধনসম্বন্ধীয় নানাবিষয়ে আমরা অত্যন্ত উপকৃত, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে শ্লাঘা করিতে পারি যে, এক জন বাঙ্গালী বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮১৬ সালে মার্ষম্যান সাহেব "সমাচার-দর্পণ" নামক সংবাদপত্র প্রথম প্রচার করেন। এই সংবাদপত্র অনেক দিন চলিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহার অনেক কাপির গ্রাহক হইয়া ইহার বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, আমরা বাল্য-কালে এই সমাচার-দর্পণ অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমাদিগের গ্রামে "বাজারিয়া" দলনামক পরপীড়ক একদল গাঁজাখোর ছিল। সমাচার-দর্পণ তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয় লেখাতে দারগা আসিয়া সুরথাল করে, তাহাতে তাহারা শাসিত হইয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৯ সালে "কৌমুদী" নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় সহমরণের বিপক্ষতা করাতে ভবানীচরণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া ১৮২২ সালে "চন্দ্রিকা" নামক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। এই চন্দ্রিকা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ও প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মুখস্বরূপ বলিয়া গণ্য। ভূত-পূর্ব্ব সল্ট বোর্ডের দেওয়ান নীলরত্ন হালদার ১৮২৫ সালে "বঙ্গদূত" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। আমার "সে কাল এ কাল" গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, বঙ্গদূতের সহিত আর একটি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের বিবাদ

হওয়াতে এবং ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মার্সম্যান সাহেব সে বিবাদের মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করাতে বঙ্গদূতসম্পাদক বলিয়াছিলেন যে, "হচ্ছিল হরুঠাকুরে ও নিলু রামপ্রসাদে, এ আবার আণ্টনি ফিরিঙ্গি কোথা থেকে এলো।" ১৮৩০ সালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন, উহা সকল সাধারণ হিতানুষ্ঠানে প্রধান উদ্‌যোগী ঠাকুরগোষ্ঠীর সাহায্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সকল প্রকাশিত হইত। এই প্রভাকরে অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণ প্রথম লেখনী চালনা করিয়া রচনা-কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করেন। এই প্রভাকর অনেক দিন অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যজগতের উপর মনোহর রশ্মিজাল বর্ষণ করিয়াছিল। প্রতিবৎসর প্রভাকরের জন্মতিথিদিবসে প্রভা-কর-সম্পাদক তাঁহার সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসব করিতেন। এই উৎসবে কতই না আনন্দ হইত! ১৮৩৫ সালে অদ্বৈতচরণ আঢ্য পূর্ণচন্দ্রোদয় সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ সালে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ভাস্কর ও রসরাজ কাগজ বাহির করেন। লোকে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে খর্ব্বাকৃতি জন্য গুড়গুড়ে বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর সঙ্গে ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্তের সর্ব্বদা লেখনীযুদ্ধ হইত। প্রভাকরপত্র যেমন তাহার উত্তম পদ্যজন্য বিখ্যাত ছিল, তেমনি ভাস্কর তাহার উত্তম গদ্যজন্য বিখ্যাত ছিল। গৌরীশঙ্কর উত্তম গদ্য লিখিতে পারিতেন। তিনি ভাস্কর কাগজ প্রথম প্রকাশ করেন বটে,

কিন্তু তিনি উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন না, প্রথম সম্পাদক আর একজন ছিলেন। উল্লিখিত প্রথম সম্পাদক আন্দুলিয়ার রাজা রাজনারায়ণের বিপক্ষে লেখাতে ছেলেধরা যেমন গোপনে ছেলে ধরিয়া লইয়া যায়, তেমনি রাজা রাজনারায়ণ তাঁহাকে কলিকাতা হইতে গোপনে বলপূর্ব্বক আন্দুলে লইয়া গিয়া কয়েক দিন তথায় কয়েদ করিয়া রাখেন। এরূপ সম্পাদকহরণ ব্যাপার বঙ্গদেশে, এমন কি বোধ হয় জগতে, কখনও ঘটে নাই। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদের কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের বিপক্ষে লেখাতে জেলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে রাজা কৃষ্ণনাথ রায় "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" নামে এক সংবাদপত্র বাহির করেন। এইটি মফঃসলস্থ সংবাদপত্রের প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৮৪৭ সালে বিখ্যাত জমীদার কালীনাথ চৌধুরী "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" নামে এক সংবাদপত্র বাহির করেন, এইটি মফঃসলে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। ১৮৫৮ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোমপ্রকাশ" প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত এই একাদশ বৎসরের মধ্যে নানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্য। এই সময়ে "আক্কেল গুড়ুম" নামে একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার লিখনভঙ্গী দেখিয়া লোকের আক্কেল যথার্থই গুড়ুম হইত। সোমপ্রকাশ প্রকাশের পূর্ব্বের সম্বাদপত্র সকল অশ্লীলতা দোষে অত্যন্ত দূষিত ছিল। প্রভাকর ও রসরাজে যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তায় দুইজন ময়লাপরিষ্কারকজাতীয় লোক ঝগড়া করিয়া পরস্পরে হণ্ডিকাস্থিত ময়লা লইয়া

পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ জঘন্য দৃশ্য হয়, সেই-রূপ জঘন্য দৃশ্য হইত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বাঙ্গালা সম্বাদপত্রকে প্রথম এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করেন।

এক্ষণে আমরা সাময়িক পুস্তিকার বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১৮১৮ সালে প্রথম সাময়িক পুস্তিকা মিসনরি-দিগের দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। তাহার নাম "দিগ্‌-দর্শন।" ইহাতে বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব সচিত্র প্রকাশিত হইত। ১৮২১ সালে রামমোহন রায় "ব্রাহ্মণ সেবধী" প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি মিসনরি-দিগের সহিত তর্ক করিতেন। ১৮৩১ সালে কালেজের বিখ্যাত শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র "জ্ঞানোদয়" প্রকাশ করেন। ইহাতে পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত, প্রাণিবৃত্তান্ত এবং বিজ্ঞানবিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত। ১৮৩২ সালে কালেজের বিখ্যাত ছাত্র গঙ্গাচরণ সেন "বিজ্ঞান সেবধী" প্রকাশ করেন। হিন্দু-কালেজের ছাত্রেরা ঐ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। উহাতে নানাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত। ১৮৪২ সালে অক্ষয়-কুমার দত্ত "বিদ্যাদর্শন" প্রকাশ করেন, তাহার পরবৎসর তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে বিদ্যাদর্শন সম্পাদনকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ১৮৫০ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি লেখ-কেরা "সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, "এই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার-রচিত এমন একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে,

সেরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালা রচনা পূর্ব্বে আর কখনই প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, আমি ঐ প্রস্তাব ওরূপ কখনই লিখিতে পারিতাম না।” ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থসংগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে বান্ধব, আর্য্য-দর্শন ও জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি অনেক উত্তম উত্তম সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। মধ্যে একটি কোয়ার্‌টার্‌লি রিভিউ অর্থাৎ ত্রৈমাসিক সমালোচনাও প্রকাশিত হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কেন প্রকাশিত হইল না, বলিতে পারি না। বঙ্গদর্শননামক সাময়িক পত্রিকা মধ্যে তিন চারি বৎসর প্রকাশিত হইয়া প্রভূতপরিমাণে লোকের শিক্ষা ও বিনোদ সাধন করিয়া অস্তমিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা এই মনোহর পত্রিকার নিকট বিশেষরূপে উপকৃত আছে।*

কথকতা অল্প পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধন করে নাই। সাবিত্রী-উপাখ্যান নামক সুকাব্যের রচয়িতা প্রিয় বন্ধু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত “সেই একদিন আর এই একদিন” প্রস্তাবে বলেন, “কথকতা বাঙ্গালিজাতির বিনোদকর উপায়সমূহের মধ্যে প্রধান উপায়। কথক বেদীতে বসিয়া স্বরসংযোগে কান্ত কোমল পদাবলীতে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিনোদসুখ ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি, এককালে উভয়ই সম্পাদন করেন। কথকতার প্রথম স্রষ্টা ও উন্নতিকারকেরা সুকবি ছিলেন। প্রভাতবর্ণন, মধ্যাহ্নবর্ণন, সন্ধ্যাবর্ণন, নিশীথ-

* এই বক্তৃতা করিবার পর বঙ্গদর্শন পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

বর্ণন, যুদ্ধবর্ণন প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণনার যে সকল বাক্যাবলী গ্রথিত আছে, তাহা অতি মনোহর ও বিস্ময়কর। বর্ণনাকালে বর্ণনীয় বিষয় শ্রোতৃবর্গের নেত্রসম্মুখে যেন মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেওয়া হয়। কথকতা শ্রবণে অনুপম আনন্দ ও পুত্রশোক নিবারণ হয়। কথকতায় অতি পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় দ্রবীভূত ও অশ্রু বিগলিত হয়। উহা এত উৎকৃষ্ট যে, ইতিপূর্ব্বে লর্ড বিশপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কথকতা প্রণালীতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে। শুনিয়াছি, কোন কোন মিসনরি না কি কথকতার রীতিতে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছে।

"এস্থলে কথকতার কিরূপে প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী-নিবাসী গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। প্রাতে যথারীতি পাঠ হইত। বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্য অন্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে একস্থানে রামায়ণ গান হইতেছে। সেইখানেই সকল লোক যাইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, 'আচ্ছা সকলকে বলিবে, কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত গান শুনিতে পাইবে।' তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি গায়ক ও কবি

ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যেয় অংশকে তাঁহার স্বকপোল উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখি-লেন। পরদিন বৈকালে নূতন রীতির কথকতা আরম্ভ করি-লেন, চারিদিক্ হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বর-সংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীতপদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদচরিত, দক্ষযজ্ঞ, বামন-ভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতেরও কথাগ্রন্থ বিরচিত হয়। গঙ্গাধর শিরোমণির পর কৃষ্ণহরি শিরোমণি কথকতাকে অনেক পল্লবিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন। গোবরডাঙ্গা-নিবাসী রামধন শিরোমণিও তাহাতে অনেক অঙ্গরাগ দিয়াছেন।”

বাঙ্গালা-ভাষায় বক্তৃতা করিবার রীতি প্রথম খৃষ্টান মিসনরিগণ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বক্তৃতার প্রণালী প্রথমে অতি অপকৃষ্ট ছিল। একজন মিসনরি বক্তৃতার সময় ঈশুর অদ্ভুত কীর্ত্তিবর্ণন সময়ে বলিয়াছিলেন, “ঈশু লাজোরকে মরা হইতে উঠান, ঈশু সমুদ্র মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যান, ঈশু গঙ্গাভূত আরাম করেন।” এস্থলে মিস-নরি সাহেব গোর হইতে উঠান না বলিয়া “মরা হইতে উঠান” বলিয়াছিলেন এবং গোঁগাভূত (নিউটেষ্টমেণ্টের dumb devil বাক্যের অনুবাদ) না বলিয়া “গঙ্গাভূত” বলিয়া-ছিলেন। এক্ষণে মিসনরিদিগের বক্তৃতাপ্রণালী কিয়ৎপরিমাণে উন্নত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ। উহা তাড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুসমক্ষে অমৃ-তের সোপান প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্রবাবু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণজন্য কতই উপ-কৃত, তাহা বলা যায় না। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ না করিলে এবং বহুল আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি বিশেষরূপে সংশোধিত না করিয়া দিলে বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির পত্তনভূমি সংস্থাপিত হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন আপনার প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই একসময়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। প্রাথমিক পত্রিকাগুলি সংশোধনজন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু তাঁহার নিকট কত উপকৃত, তাহা তিনি তাঁহার "বাহ্যবস্তু" পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। ঐ "বাহ্যবস্তু" প্রাথ-মিক তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকাগুলিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজদ্বারা প্রবর্ত্তিত বক্তৃতারীতি ধর্ম্ম উপদেশ প্রদানে নিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা অন্য সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি যে সকল সভায় উপস্থিত

লোক অধিকাংশ বাঙ্গালী, সেই সকল সভার মধ্যে যে সকল সভা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিবার জন্য ছাত্রদিগের দ্বারা সংস্থাপিত, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গালী সভার বক্তৃতাতে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে! এক্ষণে অনেক সভায় বাঙ্গালা ভাষাতে বক্তৃতাকালে আপনার মনের ভাব যথোপযুক্তরূপে ব্যক্ত করিতে অধিকাংশ লোক কষ্ট বোধ করেন। উল্লিখিত কষ্টের কারণ এই যে, অদ্যাপি আমরা দেশীয় ভাষায় কথোপ-কথন করিবার সময় অধিকাংশ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করি। আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত না হইলে বাঙ্গালা বক্তৃতায় বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। খাঁটী ইংরাজীতে কথোপকথন করিলে আমরা ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি, কিম্বা খাঁটী বাঙ্গালাতে কথোপকথন করিলে আমরা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি। কিন্তু খিচুড়ি করিলে কোন ভাষাই উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি না। যে ভাব ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে কোনমতে প্রকা-শিত হয় না, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজী শব্দ অবশ্য ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু এমন ভাব অল্পই আছে। একাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমার এক ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তিকায়* বাঙ্গালা কথোপকথনের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের প্রথম প্রস্তাব করি। ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে কলিকাতার

* Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal.—1866.

কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে এক দিন গিয়া দেখি, সেই ভবনের একজন সিবিলিয়ান যুবক তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়া একটি নূতন রকম ক্রীড়া করিতেছেন। সে ক্রীড়াটি এই যে, যে ব্যক্তি কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, প্রতি ইংরাজী শব্দ ব্যবহারজন্য এক পয়সা করিয়া তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইবেক। জরিমানার পয়সা সকল জড় করিয়া জলখাবার আনাইয়া খাওয়া হইবে। আমিও ঐ ক্রীড়ার ভাগী হইলাম। ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত কোন ব্যক্তির সাত আনা, কোন ব্যক্তির ছয় আনা, কোন ব্যক্তির পাঁচ আনা করিয়া জরিমানা হইল। আমারও দুইটি পয়সা জরিমানা হইল।

এই বক্তৃতার প্রারম্ভাবধি ও এপর্য্যন্ত উপরে যাহা বলিলাম, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধীয়। প্রচলিত বাঙ্গালাভাষা ব্যতীত আর দুইপ্রকার বাঙ্গালাভাষা আমাদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সংবাদ বোধ হয় আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই লয়েন না। তাহা খৃষ্টানী বাঙ্গালা ও মুসলমানী বাঙ্গালা। খৃষ্টানী বাঙ্গালা পূর্ব্বে অতি কদাকার ছিল, এক্ষণে অনেক পরিমাণে তাহা উন্নত হইয়াছে। মধ্যে ভবানীপুরের খৃষ্টানেরা "বঙ্গমিহির" নামে একখানি সাময়িক পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহার ভাষা বিশুদ্ধ। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জন ভাল কবিও উদিত হইয়াছেন। অসংখ্য বাঙ্গালা পুস্তক মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য প্রকাশিত হয়। বাঙ্গাল মাঝিদিগকে নৌকা লাগাইয়া তাহা পাঠ করিতে দৃষ্ট হয়। মুসলমানী বাঙ্গালার দৃষ্টান্তস্বরূপ গোলেবকোয়ালি

গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটি অংশ পাঠ করিতেছি:—

"শুন হে মুমিন সব করিয়া ধ্যায়ান।
বকাওলির পুথি এই কেতাবের নাম॥
দফা দফা কতবার ছাপা হয়েছিল।
রসিক লোকেতে তাহা চুমিয়া লইল॥
রসিক লোকের বড়া খাহেষ দেখিয়া।
ছাপাইনু পুথি আমি মেহন্নত করিয়া॥
যে জন খাহেষদার খাহেষ হইবে।
বটতলায় যাইলে পর আলবত্তা পাইবে॥
মহম্মদ আজিমুদ্দিন দপ্তরী জানিবে নাম মোর।
মস্তফাই ছাপাখানা দরিয়া কিনার॥
কম্পোজ কেরেট আর যত কিছু ভার।
হীন সদরুদ্দিন জানিবে নাম তার॥"

কবি আজিমুদ্দিন (তিনি যে আপনাকে দ্বিজ আজিমুদ্দিন বলিয়া পরিচয় দেন নাই, এই আমাদিগের ভাগ্য!) আপনার নাম চিরস্থায়ী করিয়া তৎপরে তাঁহার কম্পোজিটরের নামও চিরস্থায়ী করিয়াছেন।

পুরাবৃত্তের চিন্তাশীল পাঠকেরা প্রতীতি করিয়া থাকেন যে, এক একটি ধর্ম্ম ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি সামান্য প্রভাব প্রদর্শন করে নাই। প্রথম বৌদ্ধপ্রচারকেরা প্রচলিত ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সেই সকল ভাষার অল্প উন্নতি সাধন করেন নাই। ইউরোপখণ্ডের ধর্ম্মসংস্কারক লুথর প্রচলিত ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও তাহাতে প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রচলিত ভাষার অল্প উন্নতিসাধন করেন নাই। অন্যান্য কোন কোন ভাষা যেমন স্বীয় উন্নতি জন্য

ধর্ম্মের নিকট ঋণী আছে বঙ্গভাষাও তদ্রূপ। বঙ্গভাষা তিনটি ধর্ম্মের নিকট বিশেষ উপকৃত, সে তিনটি ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। বাঙ্গালাভাষা বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট কত উপকৃত, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের নিকট কত উপকৃত, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলি নাই। খৃষ্টান মিসনরিরা বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা দ্বিতীয় বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম সূত্রপাত করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা প্রথম বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশ করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা উন্নতপ্রকারের বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টিকর্ত্তা। খৃষ্টান মিসনরিদিগের মধ্যে কেরি ও মার্ষম্যান সাহেবের নিকট বঙ্গদেশ বিশেষ উপকৃত। সেই সকল উপকার বঙ্গবাসীরা কখনই ভুলিতে পারিবে না।

বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি নিম্নলিখিত কয়েক কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) বিদ্যাপতির কাল।
(২) চৈতন্যের কাল।
(৩) কবিকঙ্কণের কাল।
(৪) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাল।
(৫) শ্রীরামপুর মিসনরিদিগের কাল।
(৬) রামমোহন রায়ের কাল।
(৭) তত্ত্ববোধিনীর কাল।
(৮) বিদ্যাসাগরের কাল।
(৯) মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমের কাল।

এক্ষণে মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমের কাল চলিতেছে।

বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক আশা-জনক বলিতে হইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাকে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য অতি অল্প লোকে আদর করিতেন; এক্ষণে ঐ প্রকার অনল্পসংখ্যক লোক বাঙ্গালা ভাষাকে আদর করিতে দৃষ্ট হয়েন। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবুর ন্যায় ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রস্তাব রচনা করিতে হেয় বোধ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ন্যায় লোকে সেরূপ করেন না। কেহ কেহ এক্ষণে মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতে হেয় বোধ করিতেন। চতুর্দ্দিকে মাতৃভাষার সমাদর ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা বিবেচনা করিলে মনে কিপর্য্যন্ত আহ্লাদের সঞ্চার হয়, তাহা বলা যায় না। এই সমাদরের বিশেষ চিহ্ন এই যে, কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বঙ্গভাষার চালনার প্রতি উৎসাহ-প্রদানার্থ গ্রন্থকারদিগকে অর্থ পারিতোষিক ও অন্যান্য প্রকারে অর্থানুকূল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ উৎসাহ-প্রদাতার মধ্যে কাশিমবাজার-নিবাসিনী মহামান্যা মহাবদান্যা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, পুঁটিয়া-নিবাসিনী শ্রীশ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী, কলিকাতা-নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, বহরম-পুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন, রঙ্গপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর ও ভাওয়াল-

নিবাসী কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাদুর সর্ব্ব-প্রধান।*

বাঙ্গালাভাষার ভাবী অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা এক্ষণে ঠিক বলা যায় না। পুরুষের ভাগ্য যেরূপ নিরূপণ করা যায় না, ভাষারও ভাগ্য সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না। যখন রমুলস চোর বাটপাড় লইয়া রোমনগরের পত্তন করেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই কতিপয় চোর বাটপাড়ের ভাষা একসময়ে সমস্ত ইউরোপখণ্ডের বিদ্বান্‌দিগের ভাষা হইবে, এবং সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রকার ভাষা হইয়া থাকিবে? যখন মহম্মদ মুসলমানধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, মরুভূমি-নিবাসী কতকগুলি দস্যুর ভাষা একসময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিদ্বান্‌দিগের ভাষা হইবে? যখন শাক্যমুনির প্রথম শিষ্যেরা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের ভাষা পালি ভাষাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই পালিভাষা সমস্ত পূর্ব্ব আসিয়ার ধর্ম্ম-গ্রন্থের ভাষা হইবে? বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন। হয় ত ভবিষ্যতে উহা ঐ প্রকার সম্পদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার বাহ্যসম্পদ্‌ আকস্মিক ঘটনার প্রতি নির্ভর করে। আর একপ্রকার সম্পদ্‌ আছে, তাহা মনুষ্যের যত্নের প্রতি নির্ভর করে। সে সম্পদ্‌ আভ্যন্তরীণ; সে সম্পদ্‌ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ-

* এই বক্তৃতা করিবার সময় রাণী শরৎসুন্দরী মহারাণী ও রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই।

দ্বারা ভূষিত হওয়ারূপ সম্পদ্। অদ্য আটাইস বৎসর হইল, মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম, “যথার্থ বলিতে কি, হোমর, প্লেটো ও সফক্লিজ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরসপানের প্রভূত সুখসম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্রবর্ণনা-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক শেক্স্পিয়রের অমরণ-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন গেটী ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অপূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য বিশালখ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃ-সৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃতরস পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সে আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষা-রচিত কাব্যের যশঃ-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্যদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে!” যখন কতিপয় স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি ব্যতীত মাতৃভাষার প্রতি সাধারণতঃ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোকদিগের অনাদর এখনও প্রবল রহিয়াছে, তখন শীঘ্র এ আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। “মাতৃভাষার অসম্পন্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে কি কারুণ্যরসের সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন, তাঁহারাই জানেন। ইংরাজদিগের গুণ সকল অনুকরণ না করিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় পদার্থের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা

অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ধ্রুবতারার প্রতি যেমন দিগ্‌দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে, তেমনি বিদেশগত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে। সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই স্থানের সহিত তাঁহার বালসখিত্ব, সেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয় জনদিগের আবাস। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ নিরুর্ব্বর ও প্রমোদ-জনক দৃশ্যশূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ—এমন কি কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচারু গোলাবপুষ্পের উপবন ও নেপল্‌সসন্নিহিত জলের ও তটের নয়নবিমুগ্ধকর শোভায় হাস্যমান বিখ্যাত উপসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না; এমন স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে?”* যখন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ইংরাজীর সঙ্গে বাঙ্গালা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার খিচুড়ি ভাষাতে কথা কহিয়া থাকেন, যখন তাঁহারা মাতৃভাষাতে একখানি সামান্য পত্র লিখিতে হেয় বোধ করেন, যখন তাঁহারা বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, তখন স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রেম জন্মিয়াছে, ইহা আমরা কি প্রকারে বলিতে পারি? স্কুল কালেজের ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষাতে আপনাদিগের অধিকার জন্মাইবার জন্য বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়া

* হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভায় অভিব্যক্ত উল্লিখিত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।—১৭৭৮ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখ।

তাহাতে ইংরাজী বক্তৃতা করিতে পারে এবং প্রবীণ লোকেও তাহাদিগের উৎসাহার্থ তথায় গিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর অন্যান্য সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন? স্কুল কালেজের ছাত্রেরা ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিবার জন্য পরস্পরকে ইংরাজীতে পত্র লিখিতে পারে, কিন্তু প্রবীণ লোকে ওরূপ করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন? যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যখন আমরা দেখিব যে, দেশীয় ভাষাতে পত্র লিখিতে তাঁহারা হেয় বোধ করেন না, যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তখন আমরা বলিতে পারিব যে, স্বদেশের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রেম উদিত হইয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন, জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। এ বিষয়ে পাদ্রি রিচার্ড সাহেব মান্দ্রাজবিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Gentlemen! let me say there is but little hope of a nation until it has some sense of nationality, and nationality without national language, which is the free spontaneous out-come of the national mind, is a delusion. Probably the best index to the growth of a people is the growth and development of its language. Moreover there is an interchange of cause and effect; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary

to the formation of national character. I appeal then to your patriotism, I appeal to you on behalf of your mother tongue; it is well worthy your regard."

এক্ষণে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের প্রতি আমি কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগের প্রতি বিনীতভাবে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা হীন অনুকরণরীতি পরিত্যাগ করুন। শিশু সন্তান যদি চিরকালই মাতার হাত ধরিয়া চলে, তবে সে কি কখন হাঁটিতে শিখিতে পারে? সেইরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা যদি চিরকাল ইংরাজদিগের হাত ধরিয়া চলেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা কখন মহৎ গ্রন্থকার হইতে পারিবেন? অনুকরণের বিদ্যালয়ে মহত্ত্ব কখন শিখা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীন ভাবকে স্ফূর্ত্তি দিতে আরম্ভ করুন। শিশু সন্তান প্রথমে স্বাধীনভাবে হাঁটিবার সময় অনেক বার পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু সেই রকম করিয়াই হাঁটিতে শিখে। সেইরূপ গ্রন্থকর্ত্তারা আপনাদের স্বাধীনভাবকে স্ফূর্ত্তি দিলে তাঁহাদিগের প্রথমে অনেক ভুল করিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। অনেক ত্রুটির মধ্যে যদি দুই একটি প্রকৃত অভিনব ভাব থাকে, বরং সে ভাল; কিন্তু নিস্তেজ নিয়মপরতা ও পরিশুদ্ধতা ভাল নহে। আর তাঁহারা আর একটি কাজ করুন, আমরা উপন্যাসে উপন্যাসে নাটকে নাটকে জ্বালাতন হইয়াছি, দেবতার দোহাই, তাঁহারা গুরুতর বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করুন।

অবশেষে বঙ্গভাষা সমালোচনী সভার সভ্যদিগকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাব সমাপন করিতেছি। তাঁহারা

উপযুক্ত সময়েই এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে হয়। নিরুৎসাহ বৃদ্ধত্বের একটি প্রধান লক্ষণ, কিন্তু তাঁহাদিগের উৎসাহ দেখিয়া বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত যৌবনের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। উৎসাহ সাংক্রামিক গুণ; এই উৎসাহানল তাঁহারা ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকুন। তাঁহারা অচিরাৎ সুসিদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই যুবক, তাঁহারা অনেক দিন বাঁচিবেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা এক্ষণে অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি। যৌবন অতি মনোহর কাল। এক্ষণে আশা তাঁহাদিগের সম্মুখে,—উৎসাহ তাঁহাদিগের দক্ষিণে,—আনন্দ তাঁহাদিগের বামে। এক্ষণে তাঁহাদিগকে কে পায়?—ঈশ্বর তাঁহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা সফল করুন।*

---

* এই প্রবন্ধে ভুলক্রমে যথাস্থানে হেমবাবুর "বৃত্রসংহাব" নামক শ্রেষ্ঠ বীবরসপ্রধান কাব্য এবং বঙ্কিম বাবুব "বিজ্ঞানরহস্য" গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই। বঙ্কিমবাবুব "বিজ্ঞানবহস্য" কেবল মাত্র অনুবাদ অথবা সংগ্রহ নহে। এই পুস্তক এবং তাঁহাব প্রণীত "লোকরহস্য", "বিবিধসমালোচন" এবং উচ্চভাবের বহুতর তানবিশিষ্ট "কমলাকান্তের দপ্তব" প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি কেবল উপন্যাস বচনাতে অদ্বিতীয এমত নহে, অন্যান্য বিষয়েও লিখিতে অসাধাবণরূপে পারগ। গভীর চিন্তাশীল বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষের "প্রভাত চিন্তা", সাধারণীর সুযোগ্য ও সুরসিক সম্পাদক শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সবকারের প্রণীত "উদ্দীপনা" প্রভৃতি প্রবন্ধেবও কোন উল্লেখ এই বক্তৃতাতে করা হয় নাই, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শন ও বান্ধবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন এই বক্তৃতায় ঐ সামযিক পত্রিকাদ্বয়ের বিষয় বলা হইয়াছে, তখন ঐ সকল প্রবন্ধেব কথাও বলা হইয়াছে গণ্য কবিতে হইবেক।

সম্পূর্ণ।

PRINTED AT THE NEW BENGAL PRESS, 192, GREY STREET, CALCUTTA.—1878.